সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চ্যালেঞ্জের ভোট

ত্রিপুরায় ঝড় তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে ত্রিপুরার মানুষের কাছে বারবার গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানেও বাম এবং কংগ্রেসের ব্যর্থতায় বিজেপির উত্থান। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বে সব ধরনের জনবিরোধী কার্যকলাপে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। বিরোধীদের মেরে-ধরে, সন্ত্রাস চালিয়ে, ভোট করতে না দিয়ে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে ত্রিপুরার বিজেপি। এই সন্ত্রাস এমনই ছিল যে ভোটের এক বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বদল করতে হয়েছে। বিরোধীদের প্রবল দাবি সত্ত্বেও সেখানে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন হয় না। কেন্দ্রের সরকার কতখানি নির্লজ্জ এবং অগণতান্ত্রিক হতে পারে বারবার বিজেপি দেখিয়েছে। এবারের ভোটে মানুষের আত্মসম্মানের পরীক্ষা। সেই চ্যালেঞ্জ রুখে দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ। তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদন, ভোটের দিন প্রত্যেকটি নাগরিক বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের ভোট নিজে দিন। তাহলেই বিজেপি চোখে সরষে ফুল দেখবে। তাহলেই অগণতান্ত্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ সরকারিভাবে জানানো যাবে। ত্রিপুরার ভোট তাই চ্যালেঞ্জের ভোট।

e-mail থেকে চিঠি

স্বনির্ভর বাংলার মহিলারা

লটারিতে কোনও মহিলার লক্ষ টাকা প্রাপ্তি নয়। এ হল রক্ত জল করা মেহনতের ফসল। একজন নয়, পাঁচ লক্ষ মহিলার। সংখ্যাটি দিন দিন বাড়ছে। মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নানাবিধ কাজকর্ম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গর্বের শেষ নেই। ২০১১ সালে সরকারে বসার দিন থেকে এই 'অর্ধেক আকাশ' নিয়ে তাঁর নানা স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাহিনি শুনেছেন রাজ্যবাসী। তা যে কেবল কথার কথা নয়, বছরে লক্ষ টাকা রোজগার করে তার নজির রেখেছেন গ্রাম বাংলার সন্ধ্যা, মালতী, আয়েষারা। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যই বলছে, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির নিরিখে দেশের মধ্যে শীর্ষস্তরে রয়েছে বাংলা। আর সেই গোষ্ঠীর লাখপতি মহিলার সংখ্যার বিচারে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের পরই তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ। এ বড় কম সাফল্য নয়। ঘটনা হল, একদিনে এই সাফল্য আসেনি। আর্থিকভাবে মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের কোনও মহিলার একার পক্ষে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ যে কোনও কাজ করতে গেলেই ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের পক্ষে তা দেওয়াও সম্ভব নয়। অতএব নিজের চেনা গ্রামের মধ্যেই ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠী তৈরি করে স্বপ্ন বোনার কাজ শুরু। যিনি রাঁধেন তিনি চুলও বাঁধেন—এই আপ্তবাক্যকে সত্যি প্রমাণ করে গ্রাম বাংলায় এখন লক্ষ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হয়েছে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সহজে ও সুলভে তাঁদের ঋণের ব্যবস্থা করে, কাজের জায়গার মতো পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়ে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে এই মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাধীন, স্বনির্ভর করার কাজে অনুঘটকের ভূমিকায় রয়েছে মা মাটি মানুষের সরকার। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে গোটা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলা। এখন দেখা যাচ্ছে, অসংখ্য মহিলা রোজগারের সুবাদে সংসারের হাল ধরেছেন। বদলে গিয়েছে তাঁদের জীবনধারা। এঁদের অনেকেই এখন বছরে এক লক্ষ বা তার বেশি টাকা রোজগার করছেন। এই লাখপতি দিদিদের যে তথ্যপঞ্জি তৈরি করছে কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, কর্নাটকের মতো 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলার মেয়েরা। দেখা যাচ্ছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে ব্যবসা, হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে দিব্যি লক্ষাধিক টাকা রোজগার করছেন অসংখ্য মহিলা। রাজ্যের মধ্যেও আবার লাখপতি দিদি হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে হুগলি জেলা। তারপর একে একে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের নাম উঠে এসেছে। আবার রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে ব্যর্থ যোগীর উত্তরপ্রদেশ। নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজরাতেও লাখপতি দিদির সংখ্যা বাংলার অর্ধেক, আড়াই লক্ষ। জয় মমতা। জয় বাংলা। —অমিত দাস, সেন্ট্রাল জেলা, দমদম

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

মোদিজি, শুনছেন?

আর কিছুদিন পরেই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন, যদিও সাংসদরাই এখনও পর্যন্ত জানেন না উদ্বোধনের সঠিক দিনক্ষণ-মুহূর্ত। কিন্তু ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নতুন ভবন নির্মাণের আবশ্যকতা কী ছিল? গৃহ ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জানিয়েছেন পুরনো সংসদ ভবনটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের ঐতিহ্যবাহী এবং শতবর্ষপ্রাচীন হওয়ার কারণে বিপজ্জনকও বটে। এভাবে প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাত হওয়ার পর এনিয়ে প্রশ্নবাণে প্রধানমন্ত্রীকে জর্জরিত করলেন সাংসদ **জহর সরকার**।

আচ্ছা! ঔপনিবেশিক শাসনকালের স্মৃতি হলেই সেটাকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে? এরকম ঔপনিবেশিক শাসনকালের স্থাপত্য তো দিল্লি জুড়ে রয়েছে, যেগুলো ভারতীয়দের কাছ থেকে অর্থ শোষণ করে নির্মিত হয়েছিল আর যেগুলোর প্রায় সবক'টিতে ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে বিদেশি স্থাপত্যকলা মিশে গিয়েছে। মিস্টার লুটিয়েন্স-এর প্রতি মোদিজি, আপনার বিদ্বেষভাব আর গোপন নেই, তবুসন্দেও একথা কি অস্বীকার করা যাবে যে শ্রী লুটিয়েন্স-এর সৌজন্যেই সর্বপ্রথম ভারতীয়ত্বের চিহ্নবাহী ঝারোখা, ছত্রী আর ছাজা প্রিন্স ও রোমের বহু পরিচিত শৈলীর সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করে একই মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে! আর একথা জানলে কি আপনি যারপরনাই আহ্লাদিত হবেন না যে ওই স্থাপত্যশৈলীতে ছিটেফোঁটাও ঐসলামিক ঐতিহ্য বা আরব্য ঘরানা নেই। রাষ্ট্রপতি ভবনটি লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সেটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। সেটিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় শৈলীর হরগৌরী মিলন রচিত হয়েছে আর এই ভবনের চূড়াটি একেবারে বৌদ্ধ স্তূপের প্রতিরূপমাত্র।

মোদিজি, আপনি কি শতবর্ষে পা রাখলেই সেইসব ঔপনিবেশিক বাংলোগুলো ভাঙার পরিকল্পনা করছেন, যেগুলোর বর্তমান মালিক আপনারই মন্ত্রীবর্গ। আমাদের মতো করদাতা আমজনতার তাহলে আরও কয়েক হাজার কোটি টাকা খসাতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কী, ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ চরম দারিদ্রলাঞ্ছিত ভারতবাসীর উন্নতিবিধানে ব্যয়িত হওয়াটা বেশি জরুরি ছিল বলেই আমরা মনে করি। এহ বাহ্য! এটাকে কি স্বরিরোধিতা বলে মনে হয় না, যখন আপনিই রাইসিনা হিলের নর্থ ও সাউথ ব্লকের মতো একেবারে আগমার্কা ঔপনিবেশিক স্থাপত্যটি সংরক্ষণ করার ও শক্তপোক্ত করে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কারণ ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে আপনার পূর্ত বিভাগ জানিয়েছিল ওগুলোর আয়ু প্রায় ফুরিয়েছে আর ভূমিকম্প হলে ওগুলো মোটেই নিরাপদ নয়। তাই যদি হবে তবে কেন আপনার সরকার ওই দুটো ব্লকে জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল? আশা করব, ওই জাতীয় জাদুঘরে সরানোর সময় ২ লক্ষ মহামূল্যবান (কয়েকটি অমূল্যও বটে) নথিপত্রের একটিও আপনার কর্মবীররা নষ্ট করে ফেলবেন না। কীভাবে এই বিশাল নথিসম্ভার আমলারা ওই ক্ষতিগ্রস্ত, ক্রমাগত উদ্বেগের কারণ বাড়িদুটিতে ঠেলেঠুলে ঢোকান, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি।

ভাবলেও দুঃখ হয়, দারুণ দারুণ সব বাড়িগুলো, যেমন জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় মহাফেজখানা, আমাদের আবেগ জড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান ভবন (যেটার প্রবেশদ্বারটি বৌদ্ধ চৈত্যের অনুরূপ), সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া বিদেশমন্ত্রকের জওহরভবন, এগুলোর সবক'টাকেই ধূলিসাৎ করে ফেলা হবে। তাদের জায়গায় মাথা তুলবে পাথুরে ব্লক দ্বারা নির্মিত সেন্ট্রাল ভিস্টার মতোর কিছু বাড়ি আমলাদের থাকার জন্য, অথচ আমলারা কিন্তু ওরকম জায়গায় থাকতে চেয়েছেন এমনটা নয়। আমরা শুনেছি, এমন স্থাপত্য নির্মাণের প্রস্তাব এসেছে আপনার বিশ্বাসভাজন কিন্তু এমনিতে অচেনা গুজরাত থেকে আগত বাস্তুকারের পরামর্শ। সেই বাস্তুকার মহোদয় এই প্রকল্প বাবদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা পেতে চলেছেন। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এটাই যে

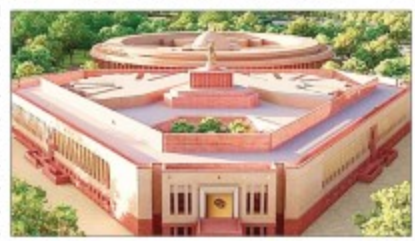

এব্যাপারে কোনও সাংসদ কিংবা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনার আবশ্যকতা সরকারের তরফে অনুভূত হয়নি। সমালোচকরা এটাকেই তুঘলকি আচরণ বলছেন। ১৪০ কোটি জনসংখ্যা সম্পন্ন দেশে বিশিষ্টতর কোনও স্থপতি বা বাস্তুকার বা নগর পরিকল্পক পাওয়া যেত না, এমনটা বোধহয় সঠিক ভাবনা নয়। তেমন কাউকে দিয়ে নকশা আর পরিকল্পনা করানো যেতে পারত।

ভিস্টার একটা অঙ্গ হল নয়া সংসদ। রাজপথ (ঘুড়ি কর্তব্যপথ)-এ যেসব বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলোর মতো অতটা দৃষ্টিকটু এই সংসদ ভবনটি নয়। তবে ভবনটিকে পুরোপুরি আমরা দেখে উঠতে পারিনি কারণ, চারদিকে আড়াল করে এটার নির্মাণকার্য চলছে। ফাঁকফোকর দিয়ে, ওই প্রজ্ঞারা যতটুকু দেখতে পায়, ততটুকুই নজরে পড়ছে। এই নয়া ভবনের সামনের দিকটা মার্সিডিজ গাড়ির সম্মুখভাগের মতো। এটা একেবারেই পুরনো সংসদ ভবন বা দিল্লির অন্যান্য সম্ভ্রম উদ্রেককারী বাড়িগুলোর মতো নয় মোটেও। রাইসিনা হিল বা লালকেল্লার সম্ভ্রম জাগানিয়া স্থাপত্যের ধারেকাছে রাখা যাবে না এই নয়া ভবনকে। বরং বলা যেতে পারে, দিল্লি শহরে সরকারি পূর্ত দফতরের আরও একটা বিশাল বাড়ি তৈরি হল, তড়িঘড়ি করে, ২০২৪ এসে পড়ার আগেই। আমরা দেখছি, পাথরে জালি কাটিয়ে সেগুলো লাগানো হচ্ছে আর ভাবছি, এগুলো আবার ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করছে! মোদিজিই একমাত্র বলতে পারেন, ভারতে স্থাপত্যশৈলীর দুর্দান্ত সব দৃষ্টান্ত থাকলেও এমন ভবনটি কিসের অনুপ্রেরণায় নির্মাণ করা হচ্ছে?

ভেতরটা বেশ আরামপ্রদ ও প্রশস্ত, যদিও যাওয়ার পথে বিশাল বিশাল থামগুলো ব্যাঘাত তৈরির জন্য দাঁড়িয়ে। ছাদটা চকচকে, ঝকঝকে, কোনও কোনও অংশে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। তবে কোনও কোনও অংশ আরও নান্দনিক আরও রাজকীয় করা যেতে পারত। শুনেছি, লোকসভার আয়তনটাই এত বড় যে রাজ্যসভার সদস্যরাও লোকসভায় বসতে পারবেন। তাহলে তো আর যৌথ অধিবেশনের জন্য সেন্ট্রাল হলের দরকারই পড়বে না। তবে যৌথ অধিবেশন ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে সব সাংসদদের আড্ডা আলোচনার জন্য সেন্ট্রাল হলটা ব্যবহার করা হত। এখন, কেন্দ্রীয় সরকার জানাচ্ছেন, একটা নয়, দু'দুটো সেন্ট্রাল হল পাব আমরা। সংসদীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেন্ট্রাল হলের বিভাজন যেন 'বিভেদ রচনা করো আর শাসন করো' নীতিরই প্রায়োগিক উদাহরণ।

নতুন ভবনের সুবিশাল এলাকার তুলনায় আমাদের সাংসদদের সংখ্যা বড়ই কম। এই বিশাল সুপ্রশস্ত ফাঁকা এলাকার ছবি দেখিয়ে টিভি চ্যানেলগুলো এমন প্রচার চালাতেই পারে যে, সাংসদরা মোটা টাকা ভাতা হিসেবে পান, কিন্তু সংসদে তাঁরা হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে নীতিনিষ্ঠ নন।

এখন তো বিরুদ্ধস্বর উচ্চারণ করার ক্ষেত্রেও মিডিয়ার একাংশের চরম আপত্তি। তারা তো 'সমালোচনার উর্ধ্বে একজন নেতা'র মডেল নিয়ে সদা উজ্জীবিত। এই মোদিজিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি লোকসভার সিঁড়ির প্রথম ধাপে নাটকীয়ভাবে চুম্বন করেছিলেন। আবার এই মোদিজিই প্রথমজন লোকসভায় প্রকৃত কাজের দিনের সংখ্যা ন্যূনতম করে ছেড়েছেন। ইনিই যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন রাজ্য বিধানসভার কর্মদিবসের সংখ্যা সর্বকালের সর্বনিম্ন করে ছেড়েছিলেন। বছরে তখন ৩০ দিন বিধানসভার অধিবেশন বসত কি না সন্দেহ।

সংসদকেও কি একই জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন মোদিজি? প্রশ্নটা সেখানেই।